বাংলার দুই মুখ

শান্তিসুধা মুখোপাধ্যায়

(১) তিস্তাপারের বৃত্তান্ত - দেবেশ রায় (দে'জ পাবলিশিং)

(২) The Hungry tide - Amitabha Ghosh (Harper collins)
বঙ্গানুবাদ : ভাঁটির দেশ - অচিন্ত্যরুপ রায় (আনন্দ পাবলিশার্স)

।। ১।।

কথাসাহিত্যে যাঁরা তর তর কর বয়ে যাওয়া সুখপাঠ্য গল্প চান, তিস্তাপারের বৃত্তান্তে তাঁরা ধৈর্য হারাবেন। এই বৃহদাকার উপন্যাসে কোনো গল্প নেই, ভিখিরি বুড়ি মাদারির মা ছাড়া দ্বিতীয় স্ত্রী চরিত্র নেই, প্রেম ভালোবাসার কোনো প্রসঙ্গ নেই, পাতার পর পাতা বর্ণনা চলেছে নিরেট পাথরের দেওয়ালের মতো, মাঝে মাঝে যে কথোপকথন আছে তার নব্বই শতাংশ রাজবংশি ভাষায় যা আমাদের অনেকেরই অপরিচিত। তবুও এইসব প্রাথমিক অসুবিধাগুলি পার হয়ে যদি বইটির ভেতরে সাহস করে ঢোকা যায় তাহলে লাভ আছে। সে লাভ এক অজানা দেশ আবিষ্কারের আনন্দ, উত্তেজনা, ও চিত্তপ্রসাদ।

তিস্তাপারের বৃত্তান্ত বইটির একটা সুস্পষ্ট ভূগোল আছে। সেটা জানা এতই জরুরি যে লেখক আখ্যাপত্রের পরেই দু পৃষ্ঠা জুড়ে জলপাইগুড়ি জেলার একটা প্রাকৃতিক মানচিত্র দিয়েছেন। সেখানে বিশেষভাবে যা দেখানো হয়েছে তা এই যে এই জেলার পুরো উত্তরদিকটা জুড়ে রয়েছে রিজার্ভ ফরেস্ট; দক্ষিণে রয়েছে ছোট বড় শহর ও গ্রাম নিয়ে লোকালয়; মোটামুটি মাঝখান দিয়ে চলে গেছে পূর্ব পশ্চিমে টানা ন্যাশনাল হাইওয়ে; আবার উল্লম্বভাবে দেখলে উত্তর থেকে দক্ষিনবাহিনী প্রায় সমান্তরাল তিনটি নদী আছে, পশ্চিমে তিস্তা, মধ্যে জলঢাকা (উপনদী ডায়না সব), পূর্বে তোর্সা। উপন্যাসের বৃত্তান্ত অল্পবিস্তর এই পুরো জায়গাটা জুড়ে। তবে প্রধান ঘটনাস্থল হল তিস্তাতীরের ক্রান্তিহাট, ঢ্যাংমারি হাট দোমহনির চর এবং আপলচাঁদ রিজার্ভ ফরেস্টের দক্ষিণাংশ।

বইটির প্রথম প্রকাশকাল ১৯৮৮। ঘটনাও মোটামুটি ঐ সময়ের, এবং শেষ কালসীমা তিস্তাব্যারেজ উদ্বোধনের রাত্রি। লেখকের মতো ঐ ব্যারেজ হবার পরে এখানকার অরণ্য ধ্বংস হবে, অর্থনীতি ও রাজনীতির পরিবর্তন হবে। জনজীবনের ছকটা বদলে যাবে, এবং তার গল্প হবে আলাদা।

ব্যারেজে বাঁধা পড়বার আগে কেমন ছিল তিস্তা? অবন্ধনা, স্বেচ্ছাচারী সেই নদী জলের নয়, ফেনার নদী। ঘন বনের মধ্যে তার অববাহিকায় শত শত বছরের পরমায়ু নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা আকাশছোঁয়া বড় বড় গাছ ছিল, সেই গাছের ডালে লক্ষ জাতের পাখির বাসা ছিল, ঘন বনে ছিল হাতি, গণ্ডার ও হরিণ, অপেক্ষাকৃত ফাঁকায় ছিল বানরের দল। আর লোকালয়ে ছিল (পরেও থাকবে) নানারকমের মানুষ। আদি বাসিন্দা রাজবংশি মর্দেশিয়া, পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তু, চাকরিসূত্রে আসা অন্যান্য অঞ্চলের লোক। এদের সকলের মধ্যেই কত না উপবিভাগ। ধনী ও দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী, ধান্দাবাজ ও বোকা, আদর্শবাদী ও সংকীর্নচেতা বিবিধ ভেদে কত রকমেরই না জীবিকা। কত না রাজনীতি। কংগ্রেস, বামফ্রন্ট, কামতাপুরি, পুরোনো নকশালি ভেদাভেদে কত না স্বার্থের টানাটানি, কতনা দলবদল ও রংবদল। বিশাল উপন্যাস জুড়ে এই এত মানুষের মুখ এবং মুখের তলায় মতলবের খেলা লেখক অভ্রান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খতায় দেখিয়েছেন। ব্যারেজ হবার পরে অল্পবিস্তর পরিবর্তনসহ এরা সবাই টিঁকে যাবে অর্থাৎ টিঁকে গেছে।

টিঁকবে না কেবল দু চার রকমের প্রাণী, যেমন হাতি, গণ্ডার, বানরের পাল, পাখির ঝাঁক, আর তারই সমগোত্রীয় মানুষ বাঘারু, মাদারি, মাদারির মায়েরা, এই বিশাল উপন্যাসে হাজার হাজার মানুষের মিছিল থেকে লেখক যদি নায়ক বলে কাউকে তুলে নিয়ে এসে থাকেন সে হল এই বাঘারু। সে গয়ানাথ জোতদারের 'মানসি' (চাকর)। নেংটিমাত্র সম্বল এই প্রানীটির শরীর ছাড়া কিছু নেই। আদ্যন্ত সে বাঁচে প্রকৃতির নিয়মে। লোকে তাকে বাঘারু বলে বটে, কিন্তু তাকে যদি কেউ নাম জিজ্ঞাসা করে সে বলে ''মোর কুনো নাম নাই রো'। গয়ানাথের কথায় সে কামতাপুরি মিছিলে মস্ত লাঠিতে ঝাণ্ডা বেঁধে আগে আগে হাঁটে বটে, কিন্তু তুমি কোন মিছিলের লোক জিজ্ঞাসা করলে বলে ''মোর কুনো মিছিল নাই।'' তাকে চেনে শুধু 'ভোখা'' কুকুর, তাকে চেনে বুড়িয়াল মহিষ, পিঠখানা যার মাঠের মত চওড়া, তাকে চেনে সূর্যগ্রহণের অন্ধকারে ভয়ার্ত, পলায়নপর আসন্নপ্রসবা মহিষানী তার রক্ষাকর্তা বলে, তাকে চেনে ডায়না নদীর বাঁকে উষালগ্নে উড়ে এসে বসা ''পাখোয়াল'' (বড় পাখি)। তিস্তা ব্যারেজ উদ্বোধনের পর শেষ রাতে তাকে তিস্তার ধার ধরে ধরে অরণ্যের গভীরে আমরা চলে যেতে দেখি। তার সঙ্গে আছে মিছিলে হারিয়ে যাওয়া আট বছরের ছেলে মাদারি। বাঘারু ''এই নতুন তিস্তাপারে নতুন ফরেস্টে বাঁচবে না। এই নদীর বাঁধ, এই ব্যারেজ দেশের অর্থনীতি বদলে দেবে, উৎপাদন বাড়াবে। বাঘারুর কোনো অর্থনীতি নেই, বাঘারুর কোনো উৎপাদন নেই। বাঘারু এই ব্যারেজকে এই অর্থনীতি ও এই উৎপাদনকে প্রত্যাখ্যান করল।''

।। দুই।।

The Hungry Tide বইখানিরও একটি নির্দিষ্ট ভূগোল আছে। সমুদ্রসন্নিহিত দক্ষিণবঙ্গে রয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ। সুন্দরবন এরই অংশ। এই বনের ভিতর দিয়ে মানবশরীরের শিরা উপশিরার মত শত শত নদীনালা জাল বিস্তার করে

রয়েছে। তাদের ধারে ধারে ভাঁটার সময় হাঁটুসমান থকথকে কাদা জমে। তার একদিকে ডাঙায় বনের আড়ালে ঘুরে বেড়ায় অরণ্যের বিভীষিকা রয়াল বেঙ্গল টাইগার, আর জলে গা লুকিয়ে সাঁতরে বেড়ায় ততোধিক ভয়ঙ্কর কুমির। প্রকৃতি এখানে কঠোর। ঝড় আসে প্রলয়ঙ্কর রূপ নিয়ে। মাটির বাঁধের দুর্বল আশ্রয়ে কোনোরকমে টিঁকে থাকা ছোট ছোট গ্রাম যখন তখন জলোচ্ছ্বাসে ডুবে যায়। এই হিংস্র শ্বাপদ ও বিমুখ প্রকৃতির মোকাবিলা করেই খাদ্যসংগ্রহ করতে হয় এখানকার মানুষকে। তাই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে তারা বুঝতে পারে কোন গাছে রয়েছে মৌমাছির চাক। কোন ঘূর্ণির তলায় পাক খাচ্ছে মাছের দল, ঘাসের আগার কাঁপন দেখে তার টের পায় ভেতরে বাঘ আছে কিনা, বাতাসের গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারে কখন আসবে ঝড়। তবু ভুল হয়ে যায়। অনেকসময় জেনেশুনেই প্রাণের দায়ে ভুল করতে হয়। ফলে অপঘাত মৃত্যু এখানে নিত্যদিনের ঘরের লোক। এই ভূখণ্ডের মধ্যে মাতলার মোহনায় গোসাবা থেকে বাসন্তী রাঙাবেলিয়া, গর্জনতলা, মারিচঝাঁপি প্রভৃতি স্থান নিয়ে যে কয়েকবর্গ কিলোমিটার অঞ্চল সেটাই এই উপন্যাসের ঘটনাস্থল। কালসীমা মোটামুটি আশির দশকের শেষ অর্থাৎ তিস্তাপারের বৃত্তান্তের সমসাময়িক।

The Hungry Tide এর লেখক অমিতাভ ঘোষ এ অঞ্চলের বাসিন্দা নন। তাঁর শিক্ষা দীক্ষা ও অভিজ্ঞতা আন্তর্জাতিক। লিখেছেনও ইংরাজি ভাষায়। কিন্তু ওখানকার জনজীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বৃত্তান্ত তিনি সংগ্রহ করেছেন তাঁর এক প্রিয় আত্মীয়ের কাছে থেকে। যিনি ঐ অঞ্চলে এক নিবেদিতপ্রাণ সমাজকর্মীরূপে বহুকাল বসবাস করেছেন। এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও পরিশ্রমী গবেষণা, যার জন্য অমিতাভ ঘোষ বিখ্যাত। তাঁর কলমে মিশর (In an antic hand) বা মায়ানমার (The Glass Palace) যে সততায় আঁকা হয় সেই একই সততায় বা ততোধিক (যেহেতু এ তাঁর স্বদেশ) নিপুনভাবে তিনি এখানকার লোকযাত্রা, সংস্কৃতি, লোকপুরাণ, জলস্থল, আকাশ, পশুপাখী ও প্রাণিবৈচিত্র্য, ভূমিপুত্র ও বহিরাগতদের জীবনচর্যায় পরিচয় দিয়েছেন।

তবে এই বই তিস্তাপারের বৃত্তান্তের মত ডকুমেন্টারির লক্ষণাক্রান্ত নয়। এটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস, এখানে গল্প আছে, চরিত্র আছে, মানবসম্পর্কের টানাপোড়ের আছে, একধরনের প্রচ্ছন্ন দার্শনিকতা আছে, লেখকের মমতাপূর্ণ হৃদয়টিও একেবারে অন্তরালে থাকেনি। গল্পের গোড়ার দিকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন গোসাবার ইতিবৃত্ত। শতাব্দীপূর্বে ভ্যানিয়েল হ্যামিলটন নামক এক সাহেব এখানে এসেছিলেন। আধুনিক সভ্যতার যে দিকটি কল্যাণময় তিনিই তা প্রথম গোসাবায় আনেন। অনেক পরে এখানে এসেছেন নির্মল বা নীলিমার মতো লোকেরা। তাঁদের আধুনিক জ্ঞান ধ্যানধারণা ও উদ্যমের দ্বারা এদেশের অনেক ভাল হয়েছে। আবার সম্পূর্ণ বহিরাগত সাময়িক অতিথিও কত এসেছে। যেমন কানাই বা পিয়া। শিক্ষিত নাগরিক মন ও বিচারবুদ্ধি দিয়ে তাঁরাএ দেশকে দেখেছেন। এই উপন্যাসের বৃত্তান্তটি রচিত হয়েছে এঁদেরই দৃষ্টিকোন থেকে। পুরুষানুক্রমে যাঁরা এখানকার অধিবাসী সেই দরিদ্র সংগ্রামশীল, ভাগ্যতাড়িত, মূক মানবতাকে আমরা তিস্তাপারের বৃত্তান্তের মত এখানেও শয়ে শয়ে দেখি, কিন্তু তারা কেউ এগিয়ে এসে আত্মঘোষনা করে না। দু একজন ছাড়া তারা সকলেই গ্রীক নাটকের কোরাসের মত চালচিত্র রচনা করে নেপথ্যে থেকে যায়।

পাদপ্রদীপের সামনে আসা চরিত্রগুলির মধ্যে লেখক এক নিগূঢ় সম্পর্কের জাল বুনে দিয়েছেন। সেটাই এই উপন্যাসের দার্শনিকতা ও সৌন্দর্য। সম্পর্ক বলতে লোকে বোঝে প্রেম বা সেক্স্। কিন্তু এ সম্পর্ক সে জাতের নয়। মানুষে মানুষের আর এক রকমের বন্ধন আছে যা স্বভাবের গভীরতম স্তরের মিল থেকে উঠে আসে। তা থেকে তৈরি হয় সহমর্মিতা, আস্থা, বিশ্বাস বন্ধুত্ব। অনেক সময় তা অচেতন ও অনুচ্চারিত থাকে। তবুও তা আছে বলেই পশুর সঙ্গে মানুষের তফাৎ। সেই সম্পর্ক আমরা অনুভব করি বাংলা না জানা আমেরিকাপ্রবাসী গবেষেক মেয়ে পিয়ার সঙ্গে সুন্দরবনের নিরক্ষর, প্রায় মূক, অবহেলিত হতদরিদ্র ফকির মাঝির; অভিজাত সুশিক্ষিত প্রৌঢ় নির্মলের সঙ্গে বাদাবনের অনাথ মেয়ে অধুনা মরিচ ঝাঁপির মৃত্যুতাড়িত আগন্তুক কুসুমের; অথবা দিল্লিপ্রবাসী উচ্চ চাকুরে কানাইয়ের সঙ্গে আত্মবিশ্বাসী, উচ্চাভিলাষী গ্রাম্য গৃহিনী ময়নার। শিক্ষা, বয়স, অবস্থা, অর্থ এইসব পোষাকগুলি খুলে ফেললে অনাবৃত মানবপ্রকৃতি কোথায় কার দোসর খুঁজে পায় তা উপলব্ধি করে আমাদের চিত্তশুদ্ধি ঘটে। এটাই এই উপন্যাসের দার্শনিকতা।

।। তিন।।

বাংলা কথাসাহিত্য কলকাতা ও তৎকেন্দ্রিক শিক্ষিত, উচ্চ বা উচ্চমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনসমস্যাই সিংহভাগ অধিকার করে আছে। কিন্তু তারাই যে সব বাঙ্গালীর প্রতিভূ নয় সেটা জানবার প্রয়োজন। বাংলার উত্তর ও দক্ষিণের দুই প্রান্ত সীমার দুরকম বৃত্তান্ত আমাদের তাই একটা মুক্তির স্বাদ এনে দেয়।

সৃষ্টিসন্ধান